গ্রামীণ অর্থনীতি : বরিশালের হিজলা উপজেলার মেমানিয়া ইউনিয়নের চিত্র-২

মোঃ শফিকুল ইসলাম

এই মাঠ গবেষণার মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তনের ধরন অনুসন্ধান করা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ থেকে কিছু বিষয় এই প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অঞ্চলটি হল– বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার মেমানিয়া ইউনিয়ন। গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে ২০১৮ সালে।

মেমানিয়া মূলত একটি চর ইউনিয়ন, যেটা মেঘনা নদীর আশীর্বাদে মেঘনার বুকে জেগে উঠেছে। এই চরের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না, তবে স্থানীয়দের মতে, স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাক্কালে মানুষ এই চরে বসবাস শুরু করে, যেটা ১৯৬৯ বা ১৯৭০-এর আশপাশে হবে। ইউনিয়নটিতে কোন সরকারি বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।

পূর্ব প্রকাশিতের পর থেকে...

৬. মেমানিয়ার আয় ও সঞ্চয়

মেমানিয়ার সিংহভাগ আয়ই হয় দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে। গুরুত্বপূর্ণ পেশার মধ্যে কৃষক, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, শিক্ষক, পেশাজীবী এবং অন্যান্য (দিনমজুর, কাঠমিস্ত্রি, বিদ্যুৎমিস্ত্রি, রাজনীতিবিদ উল্লেখযোগ্য)। মেমানিয়াতে ব্যবসা বলতে মূলত মুদি দোকানদার, খাবার হোটেল মালিক এবং চা বিক্রেতা। এছাড়া অন্যান্য ভোগ্যপণ্য বিক্রেতা বিভিন্ন পেশায় চিহ্নিত হয়েছে (সবজি বিক্রেতা মূলত কৃষক, মাছ বিক্রেতা অধিকাংশই জেলে– অনেকটা এমন)।

৬.১ মাসিক আয়ের পরিধি

পেশা	মাসিক আয় (টাকায়) [নিম্ন থেকে উচ্চ]	অবস্থা
কৃষক	৫০০-৫০০০০	অনির্ধারিত
চাকরিজীবী	১০০০০-১৬০০০	নির্ধারিত
ব্যবসা	৩০০০-৫০০০০	অনির্ধারিত
জেলে	১৫০০০-৬০০০০	অনির্ধারিত
শিক্ষক	২২০০০-৩০০০০	নির্ধারিত
অন্যান্য (দিনমজুর, কাঠমিস্ত্রি, বিদ্যুৎমিস্ত্রি, রাজনীতিবিদ, মাঝি)	২০০০-৫০০০০	অনির্ধারিত

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র শিক্ষক ও চাকরিজীবীদেরই নির্ধারিত আয় রয়েছে; বাকি আর কোন পেশায়ই আয় নির্ধারিত নয়। কোন কোন মাসে আয় অনেক বেশি থাকলেও তার পরের মাসে এমনটাই থাকবে সেটা বলা যায় না। কোন একটি মাসে ভাল থাকলেও পরের মাসের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর মত আয় থাকবে সেটা প্রায় অনিশ্চিত। কিছু কিছু পরিবারের দুই বেলার আহার জোটানোও কষ্টকর হয়ে যায়। আগেই বলেছি যে, কর্মজীবী মানুষের মাত্র ৩.৯৩ শতাংশ হচ্ছে শিক্ষকতা ও চাকরিজীবী পেশার মানুষ, বাকি ৯৬.০৭ শতাংশ কর্মজীবী মানুষেরই নির্ধারিত মাসিক আয় নেই, যেটা স্পষ্টভাবেই এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

পেশা	টাকা
নির্মাণ শ্রমিক	৪০০-৪৫০
ইটভাটার শ্রমিক	৩৫০-১০০০
কৃষি শ্রমিক	৩০০-৪০০ + দুপুরের খাবার
মাছ ধরার নৌকার শ্রমিক	৪০০-৫০০
বিদ্যুৎ মিস্ত্রি	৩০০-৪০০
কাঠমিস্ত্রি	২৫০-৩০০
মাঝি	৫০০-৭০০ + তেলের খরচ

৬.২ মজুরির তালিকা

তালিকায় দেয়া মজুরির মাধ্যমে বিভিন্ন কাজে শ্রমিক ভাড়া করা সম্ভব। ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই মজুরি বহাল ছিল।

৬.৩ ইটভাটা

ইটভাটা মেমানিয়াতে উল্লেখযোগ্য একটি পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। কৃষিভিত্তিক সমাজের মেমানিয়াতে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় কাজের বেশ আকাল থাকে। এসময় কৃষকদের হাতে তেমন কোন কাজই থাকে না। পূর্বে অনেককেই ঢাকা বা দেশের অন্যান্য জেলা শহরে কাজের তাগিদে চলে যেতে হত, নতুবা অনাহারে দিন যাপন করতে হত। নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকলে জেলেদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। এই মৌসুমি শ্রমিকরা ইটভাটায় কাজ করে নিজেদের পরিবারের ভরণ-পোষণ চালায়। বছরের অন্যান্য সময় অন্য ইউনিয়ন থেকে শ্রমিক এসে কাজ করে স্থানীয় ইটভাটায়। বাইরের শ্রমিকদের মজুরি কিছু বেশি হলেও স্থানীয় শ্রমিকদের কম খরচে ভাড়া করা যায়, তাই চাহিদা বেশি। মৌসুমি বেকারত্বের সৃষ্টি হলে বাইরে থেকে শ্রমিক ভাড়া করা হয় না বললেই চলে। পূর্বে মেমানিয়াতে ১-২টি ইটভাটা থাকলেও বর্তমানে ২২-২৩টি ইটভাটা রয়েছে। ইটভাটার ব্যবসা শুরু হয় ২০০৯-১০ সালের দিকে, স্থাপনের পর থেকেই এগুলো স্থানীয় কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখছে কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতির ওপর বিরূপ প্রভাবও অনেক বেশি।

কাঁচামাল : ইটভাটার কাঁচামাল হিসেবে সরাসরি নদী থেকে

উত্তোলিত কাদামাটি ব্যবহার করা হয়। বলতে গেলে কাঁচামালের কোন খরচ নেই, শুধুমাত্র ড্রেজার ভাড়ার টাকা দিতে হয়। ইটভাটার মালিকরা শুকনো মাটি কিনে থাকে কাদামাটির সাথে মেশানোর জন্য। মূলত কৃষিজমির ওপরের মাটি ঝরঝরা থাকে বিধায় এর চাহিদা বেশি। ১০০০ বর্গফুট জায়গার জমির শুকনো মাটির জন্য জমির মালিক ৬০০০ টাকা পায়। ইটভাটার চুল্লিতে কয়লা ও কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও কাঠ ব্যবহার সাশ্রয়ী বলে বেশি।

ইটভাটার শ্রমিকরা দুই ধরনের কাজ করে থাকে এবং মজুরিও আলাদা। যারা কাঁচা ইট তৈরি করে, তাদের দৈনিক ৮০০-১০০০ টাকা অবধি মজুরি এবং যারা ইট তৈরির মাটি সংগ্রহ করে তাদের দৈনিক মজুরি ৩৫০-৪০০ টাকা। ইটভাটাগুলোই মেমানিয়ার একমাত্র আধুনিক অর্থনৈতিক সেক্টর।

ইটভাটার প্রকার : দুই ধরনের ইটভাটা আছে মেমানিয়াতে–১. সাধারণ বা ছোট ভাটা, ২. হাওয়া ভাটা বা বড় ভাটা। এই অঞ্চলের ইটভাটাগুলো সাধারণত ছয় মাস সচল থাকে। হাওয়া ভাটায় কংক্রিটের চিমনি ব্যবহার করলেও ছোট ভাটাগুলো অধিকাংশই ড্রাম চিমনি ব্যবহার করে।

উৎপাদন : ছোট ভাটাগুলো প্রতি মাসে ৫০-৫২ লাখ ইট উৎপাদন করতে পারে এবং হাওয়া ভাটাগুলোতে ৮৫-৯০ লাখ ইটের উৎপাদন হয় মাসিক। ৬.৫ লাখ ইট একবারে একটি সাধারণ ভাটার চুল্লিতে পোড়ানো যায় এবং একাধারে ২২-২৩ দিনের মত এই ইট পোড়াতে হয়। বাৎসরিক একটি সাধারণ ভাটা থেকে প্রায় ৩-৩.৫ কোটি ইটের উৎপাদন হয় এবং হাওয়া ভাটা থেকে ৫-৫.৫ কোটির ওপরে ইট উৎপাদন হয়ে থাকে।

ইটের বাজার : এখানে উৎপাদিত ইট মূলত বরিশাল শহর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, হাতিয়া-সন্দ্বীপ এবং স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে থাকে। তাছাড়া এখানের ইটভাটার মালিকদের অনেকের সাথেই সরকারিভাবে কন্ট্রাক্ট করা হয়েছে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজের ইটের জোগান দেয়ার জন্য এবং নিয়মিতভাবেই সেতু নির্মাণের ইটের চালান পাঠানো হচ্ছে এখান থেকে। পদ্মা সেতু ছাড়াও রোহিঙ্গাদের জন্য তৈরি ভাসানচরের শরণার্থী শিবিরের নির্মাণকাজের ইটের জোগানও এখান থেকে দেয়া হচ্ছে।

লাভ : মেমানিয়ার প্রতি পিস ইট ৭.৫ টাকায় বিক্রি করা হয়। বার্ষিক লাভের পরিমাণ সকল ধরনের খরচ বাদ দিয়ে মালিকরা জানিয়েছে, একটি সাধারণ ভাটায় বার্ষিক ১.৯০-২.৫ কোটি টাকা লাভ হয় এবং হাওয়া ভাটায় এই লাভের পরিমাণ ২.৭-৫ কোটির ওপরে। অত্যধিক এই লাভের কারণেই ইটভাটা স্থাপনের হার বাড়ছে দ্রুত।

৬.৪ আয় ও সঞ্চয়ের হিসাব

এই গবেষণা অনুযায়ী, মেমানিয়ার একটি পরিবারের গড় মাসিক আয় ১১২৭০.৪১ টাকা বা ১৩৪.৩৭ ডলার এবং গড় বার্ষিক আয় প্রতি পরিবারের ১৩৫২৪৪.৯২ টাকা বা ১৬১৩ ডলার। প্রতি পরিবারের গড় মাসিক সঞ্চয় ১৯২৪.৪৯ টাকা বা ২২.৯৭ ডলার। [১ ডলার=৮৩.৯৬ টাকা ধরে]

মেমানিয়ার অভ্যন্তরের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যুক্ত না থাকায় এর অর্থনীতিকে বদ্ধ অর্থনীতি হিসেবে গণ্য করা যায়। এর থেকে মেমানিয়ার প্রতি পরিবারের মাসিক ভোগের পরিমাণ জানা সম্ভব। আমরা জানি, Y=C+S+T

এখানে, Y=$134.37 [আয়], S=$22.97 [সঞ্চয়] and T=$0 [ট্যাক্স]

সরকার কর্তৃক আরোপিত কোন কর নেই এই অঞ্চলে, এজন্য শূন্য ধরা হয়েছে।

C=Y-S-T=$134.37-$22.97-$0=$111.4

কাজেই প্রতি পরিবারের গড় মাসিক ভোগের পরিমাণ ১১১.৪ ডলার বা ৯৩৫৩.১৪৪ টাকা। গড়ে একটি পরিবারের সদস্য ৫ জন [অধ্যায়-৩ থেকে প্রাপ্ত]।

৭. মেমানিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দারিদ্র্য

৭.১ অর্থনৈতিক অবস্থা

বিশ্বব্যাংকের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য চারটি আয়ের পরিধি রয়েছে। পরিধিগুলো দেয়া হল :

১. নিম্ন আয় (০-১০২৫ ডলার)
২. নিম্ন মধ্য আয় (১০২৬-৪০৩৫ ডলার)
৩. উচ্চ মধ্য আয় (৪০৩৬-১২৪৭৫ ডলার)
৪. উচ্চ আয় (১২৪৭৬ ডলার)

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতে, বর্তমানে (২০১৯) বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৯০৩ ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থান নিম্ন মধ্য আয়ের।

মেমানিয়ার প্রতি পরিবারের গড় বার্ষিক আয় ১৬১৩ ডলার; গড়ে একটি পরিবারের সদস্য ৫ জন। অর্থাৎ মাথাপিছু বার্ষিক আয় দাঁড়ায় ৩২২.৬ ডলার, যা মাসিক ২৬.৯ ডলার, যা দৈনিকের হিসাবে হয় ০.৮৯ ডলার [১ মাস=৩০ দিন ধরে]। যেটা নির্দেশ করছে, মেমানিয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্ন আয়ের, দারিদ্র সীমার নীচে। নিম্ন আয়ের পরিধি অতিক্রম করতেও এখনও বহু পথ পাড়ি দেয়া বাকি।

৭.২ আয় সূচকে দারিদ্র্য

বিশ্বব্যাংকের মতে, দৈনিক যদি কারও ২ ডলারের নিচে আয় থাকে তবে সে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। মেমানিয়ার মানুষের আয় বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রায় ৯৩.৬ শতাংশ মানুষই চরম দারিদ্র্যের নিচে অবস্থান করছে, যাদের দৈনিক আয় ২ ডলারের নিচে।

৭.৩ খাদ্য ক্যালরি ইনটেক মেথডে দারিদ্র্য

মেমানিয়ার মত একটি চরাঞ্চলে আয় সূচকে দারিদ্র্য নির্ধারণ করা বেশ ঝামেলার, কেননা এখানে কর্মজীবী মানুষের ৯৬.০৬ শতাংশেরই নির্দিষ্ট আয় নেই। নির্দিষ্ট আয়বিহীন এসব মানুষের কোন মাসে আয় অত্যধিক হচ্ছে, কোন মাসে দুই বেলার ভাতের টাকাও থাকে না।

এটা স্বীকৃত যে, প্রতিটি মানুষের দৈনিক কমপক্ষে ২১০০ ক্যালরির খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। আয়স্বল্পতার কারণে এই পরিমাণ ক্যালরির খাদ্য গ্রহণে কেউ ব্যর্থ হলে সে দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত হবে। আয় সূচক থেকে আমরা জানি, দৈনিক গড়ে একজন মেমানিয়ার মানুষের আয় ০.৮৯ ডলার। এই পরিমাণ আয় দিয়ে গড়ে প্রতিটি মানুষ ১৬৯১.৪৮ ক্যালরির খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, যেটা ২১০০ ক্যালরি থেকে বেশ কম এবং দারিদ্র্য নির্দেশ করে। দৈনিক গড়ে একজন পুরুষের ক্যালরি গ্রহণ ১৮০১.১০ এবং মহিলাদের গৃহীত ক্যালরির পরিমাণ ১৫৭২.১৯। পুরুষ বা মহিলা কোন ক্ষেত্রেই তা ২০০০ বা ২১০০ ক্যালরি স্পর্শ করে না। [এই সমীক্ষাটি করার জন্য ২০০ জন মানুষের ৩ দিনের ৩ বেলার খাদ্য তালিকার গড় ক্যালরির হিসাব নেয়া হয়েছে] তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে, ২১০০ ক্যালরির হিসাবে মেমানিয়ার প্রায় ৯১.৫৫ শতাংশ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে এবং মাত্র ৮.৪৫ শতাংশ মানুষ এই দারিদ্র্যসীমার ওপরে অবস্থান করছে।

দারিদ্র্যসীমার মাত্রাটা যদি ২০০০ ক্যালরি ধরা হয়, তবে ৮৫.৯২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে এবং ১৪.০৮ শতাংশ এর ওপরে অবস্থান করে।

৭.৪ অনুপাত

আয় সূচক অনুযায়ী, মেমানিয়ার চরম দারিদ্র্যের অনুপাত ৯৩.৬ শতাংশ; অন্যদিকে খাদ্য ক্যালরি ইনটেক মেথডে আমরা দারিদ্র্যের অনুপাত পেয়েছি ৯১.৫৫ শতাংশ। উভয় ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের পরিমাণ ৯০ শতাংশের বেশি নির্দেশ করছে। তথ্যগত ত্রুটির কারণে প্রকৃত দারিদ্র্যের পরিমাণ জানা না গেলেও আমরা বুঝতে পারছি, এই অঞ্চলে এখনো ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। দুটি পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে গড় হিসাবে আমরা বলতে পারি, ৯২ শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে।

৮. মেমানিয়ার শক্তি ও বিদ্যুৎ

মেমানিয়ার শক্তির চাহিদা এবং ব্যবহার খুবই সাধারণ। এই অঞ্চলের শক্তির মূল চাহিদা বিদ্যমান রয়েছে শুধুমাত্র গৃহস্থালির ব্যবহার্য দ্রব্যাদির জন্য [যেমন–ফ্যান, লাইট, টেলিভিশন, মোবাইল], ট্রলার, সেচ পাম্প, মোটরসাইকেল, রান্না এবং অন্যান্য কৃষিযন্ত্রাদি চালানোর জন্য। বর্তমানে এই যন্ত্রাংশগুলো সৌরশক্তি অথবা তাপশক্তির মাধ্যমে চালিত হচ্ছে।

৮.১ মেমানিয়ার বৈদ্যুতিক অভ্যুত্থান

২০০৬-০৭ থেকে এই অঞ্চলের মানুষ নিজেদের ঘরবাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপনের কাজ শুরু করে, মূলত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সহায়তায় এই সোলার প্যানেল স্থাপনের কাজ শুরু হয়। প্রথম দিকে এই সোলার প্যানেলগুলো ২-৩টি বাতি জ্বালানোর জন্যই ব্যবহৃত হত, তবে দিনের সাথে সাথে শক্তিশালী সোলার প্যানেলের ব্যবহার শুরু হয়, যেগুলো দিয়ে ফ্যান, টিভি, মোবাইল, ডিভিডিসহ নানা যন্ত্রাংশ চালানো যায়। যেহেতু এই অঞ্চলে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ নেই, সেহেতু সৌরবিদ্যুৎই মানুষের একমাত্র ভরসা। অবশ্য ২০১৮-তে এই গবেষণা চলাকালে চরের কিছু অংশে জাতীয় গ্রিডের বৈদ্যুতিক পিলার স্থাপন করতে দেখা গিয়েছিল। কিছু কিছু মানুষ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তেলচালিত জেনারেটর ব্যবহার করে স্থানীয় বাজারে; গৃহস্থালির কাজে জেনারেটরের ব্যবহার দেখা যায় না।

২০০৬-০৭ থেকে এই অঞ্চলে বিভিন্ন এনজিও কাজ শুরু করে, এসব এনজিওর প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ছিল কিস্তিতে সোলার প্যানেল বিক্রি করা। অল্প টাকায় বিদ্যুতের সুবিধা পাওয়া যাবে–এই চিন্তাধারা থেকেই মানুষ ঘরে সোলার প্যানেল স্থাপন শুরু করে। ২০১৮-তে এসে এখন সৌরবিদ্যুতের জয়জয়কার চলছে মেমানিয়ায়। সোলার প্যানেলগুলো ন্যূনতম ৪০০০-৭০০০ টাকার [ব্যাটারিসহ] মধ্যে এবং শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে প্যানেলের আকার অনুযায়ী দাম বৃদ্ধি হয়। সৌরবিদ্যুতের এই খরচটা এককালীন, একবার স্থাপনের পর আর কোন ধরনের খরচাদি ভোক্তাদের বহন করতে হয় না।

৮.২ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী

সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়েছে ১০-১১ বছর আগে, বর্তমানে এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের অবস্থা জানার জন্য একটি গবেষণা করা হয়। গবেষণায় ১৪৯টি পরিবার অংশ নেয়, যেখানে দেখা যায় ১২১টি পরিবার সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করছে এবং অপর ২৮টি পরিবারে এখনও কোন ধরনের বিদ্যুতায়ন নেই।

অর্থাৎ ৮১.২১ শতাংশ মানুষ এই অঞ্চলে জাতীয় গ্রিডের সেবা ছাড়াই বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করছে এবং বাকি ১৮.৯৭ শতাংশ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে আছে। এই পরিসংখ্যানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই রয়েছে। পরিবেশবান্ধব সৌরশক্তি ব্যবহার করে পুরো ইউনিয়নের প্রায় ৮১.২১ শতাংশ মানুষের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো হচ্ছে, যেটা অবশ্যই একটি ইতিবাচক দিক। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে বা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে পুরো ইউনিয়নটিকেই পরিবেশবান্ধব সৌরশক্তির মাধ্যমে আলোকিত করা সম্ভব হবে; এর জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে সরকারের পরিবেশবিরোধী বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন নেই।

আর নেতিবাচক দিক হিসেবে দেখতে হলে বলতে হবে, ২০১৮-তে এসেও এই অঞ্চলের ১৮.৭৯ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সেবার বাইরে, যেখানে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে দেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশে বিদ্যুৎ রফতানির, সেখানে নিজের দেশের মানুষই বিদ্যুৎ সেবার বাইরে রয়েছে।

উপাদান	বাতি	পাখা	টিভি ও ডিভিডি	রেডিও	ল্যাপটপ
শতাংশ	১০০%	৪৮.৭৬%	২.৪৮%	১৭.৩৬%	১.৬৫%

ওপরে বর্ণিত ৮১.২১ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর মধ্যে ১০০ শতাংশের ঘরেই বাতি রয়েছে; ৪৮.৭৬ শতাংশের ঘরে পাখা রয়েছে। ২.৪৮ শতাংশ মানুষের টিভি ও ডিভিডি রয়েছে। ১৭.৩৬ শতাংশ মানুষ রেডিও ব্যবহার করে বিনোদনের জন্য। ১.৬৫ শতাংশ মানুষের ল্যাপটপ কম্পিউটার রয়েছে; এই কমপিউটারগুলো মূলত বাণিজ্যিক কাজে কিছু ব্যবসায়ী ব্যবহার করে। তারা বিভিন্ন ভিডিও, গান ইত্যাদি মানুষের ফোনে লোড করে দেয়ার ব্যবসা করে থাকে।

৮.৪ মেমানিয়ার বিদ্যুৎ খাতের ভবিষ্যৎ এবং সম্ভাবনা

সরকারি অর্থায়নে বর্তমানে বৈদ্যুতিক পিলার স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে মেমানিয়ায় পল্লি বিদ্যুতের অধীনে। নিকট ভবিষ্যতে হয়ত বা এই অঞ্চল জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। তবে এত বিশাল অর্থায়নের মাধ্যমে এখানে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার কোন দরকার ছিল না। যেহেতু মেঘনা নদীর ওপর থেকে গ্রিডের লাইন টানা লাগবে, সেহেতু সাধারণের চেয়ে খরচও বেশ বেশি পড়বে এই অঞ্চলে। বেশি খরচের আশঙ্কা সৃষ্টি হলেই দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই দূরবর্তী অঞ্চলগুলো জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই বাড়তি প্রয়োজন মেটাতে আরও বেশি বেশি কয়লা, তাপ, গ্যাস, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন পড়বে; বাস্তবিকভাবে উল্লিখিত একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও পরিবেশবান্ধব নয়। বরং 'সবুজ জিডিপি' বাস্তবায়নের জন্য অনেক উন্নত দেশই এসব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ করে নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে নজর দিচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশ সরকার চাইলেই এই অঞ্চলটিতে সবুজ শক্তির বিপ্লবের জায়গা করতে পারত। বর্তমানে পুরো ইউনিয়নের ৮১.২১ শতাংশ মানুষই সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সুফল ভোগ করছে। জাতীয় গ্রিডে যুক্ত না করে সরকার চাইলেই এই ইউনিয়নে একটি সৌরবিদ্যুতের কেন্দ্র অথবা বায়ুবিদ্যুতের টার্বাইন স্থাপন করতে পারত। চরের চারপাশে নদী থাকায় চরের কিনারায় পর্যাপ্ত বাতাস থাকে বারো মাসব্যাপী এবং এই বাতাস উইন্ড টার্বাইন ঘোরানোর জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এই অঞ্চলে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে এই অঞ্চলের সকল মানুষের বিদ্যুৎ চাহিদা খুবই

ভালভাবে মেটানো সম্ভব ছিল। এতে মানুষের ওপর দীর্ঘমেয়াদি বিলের বোঝা চেপে বসত না।

৯. মেমানিয়ার পরিবেশ বিপর্যয়

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সব কিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ বা প্রকৃতি যখন তার স্বাভাবিক রূপে থাকতে ব্যর্থ হয় তখনই বস্তুত পরিবেশ বিপর্যয়ের সূচনা হয়। মেমানিয়ার পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়গুলো সামনে আসছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশ বিপর্যয়ের হারও বাড়ছে। মেমানিয়ার পরিবেশ বিপর্যয়ের কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হল–

জলযান : মেমানিয়া যেহেতু একটি চর এলাকা, কাজেই মূল ভূখণ্ড থেকে মেমানিয়ায় যেতে হলে অবশ্যই কোন না কোন জলযান ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। পূর্বে বইঠা বা লগি চালিত নৌকার ব্যবহার হলেও বর্তমানে ট্রলার বা ইঞ্জিনচালিত নৌকার বহুল ব্যবহার হচ্ছে। এই জলযানগুলো সকল ধরনের তরল বর্জ্য সরাসরি পানিতে ফেলে থাকে, যা চরের ভেতরের খাল বা নদীর বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতি করছে। চরের ভেতরের প্রবহমান জলাশয়গুলোতে মাছ বা অন্যান্য জলজ প্রাণী অবস্থান বহুলাংশে কমেছে। অতীতে চরের অভ্যন্তরীণ খালগুলোতে পাঙ্গাশ-রুই-বোয়ালের মত বড় মাছ পাওয়া গেলেও বর্তমানে ছোট ছোট পুঁটি-টাকি ব্যতীত অন্য কোন মাছের দেখা পাওয়া যায় না। ছোট মাছ প্রাপ্তির হারও যথেষ্ট কমে গেছে।

স্থলযান : স্থানীয় বেকার যুবকদের আয়ের অন্যতম পছন্দ মোটরসাইকেলে যাত্রী পরিবহন। বেকার যুবকদের এই আয় মেমানিয়ার মোটরসাইকেলের পরিমাণ ব্যাপক হারে বাড়িয়েছে; সাথে সাথে বেড়েছে কার্বন নিঃসরণের হার। পূর্বে অল্প কিছু তেলের বাহন থাকলেও বর্তমানে প্রচুর মোটরসাইকেলের দূষণ স্থানীয় পরিবেশের সহনীয় মাত্রার বাইরে চলে যাওয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে। চরের মূল সড়কে অবস্থান করলে এখন কালো ধোঁয়ার অস্তিত্ব বেশ ভালভাবেই টের পাওয়া যায়, একই সাথে মোটরসাইকেল চলাচলের রাস্তার তাপমাত্রাও পার্শ্ববর্তী বসবাসের অঞ্চল থেকে বেশি অনুভব করা যায়।

ইটভাটা : অর্থনৈতিক উন্নয়নের গেম চেঞ্জার হলেও এই অঞ্চলের ইটভাটাগুলো গোদের উপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইটভাটাগুলো থেকে মাত্রাতিরিক্ত লাভ অনেককেই ইটভাটা স্থাপনের দিকে টেনে আনছে। লাভের পরিমাণ আরও বাড়াতে কোন ইটভাটাতেই ন্যূনতম নিরাপত্তা [রাসায়নিক চিমনি বা ছাঁকনি ব্যবহার করা হয় না] নেয়া হয় না, যাচ্ছেতাই ভাবেই চালানো হচ্ছে ইটভাটাগুলো। সরাসরি মাটি নদীগর্ভ থেকে উত্তোলনের জন্য নদীর প্রবাহপথের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, নদীর মাঝে মাঝে হরহামেশাই চর পড়ে যাচ্ছে। মেঘনায় এমন ডুবোচরের জন্য প্রায়ই ঢাকা-বরিশালগামী লঞ্চ দুর্ঘটনার শিকার হয়; মাঝনদীতে ডুবোচরে লঞ্চের আটকে যাওয়ার মত ঘটনাও ঘটে থাকে। তাছাড়া নদীর মাঝে মাঝে চর জেগে উঠায় লঞ্চের যাত্রাপথেরও অনেক পরিবর্তন করতে হয়, যার দুর্ভোগ পড়ে লঞ্চের যাত্রীদের ওপর, অধিক ভাড়া গোনার মাধ্যমে। এছাড়াও ইটভাটায় ইট তৈরির জন্য ফসলি জমি থেকে শুকনো মাটি সংগ্রহ করা হয়, যার ফলে ফসলি জমির উর্বর অংশটুকুই ইট তৈরিতে চলে যাচ্ছে, আর অবশিষ্ট অংশে কোন ফসলই আর ফলানো যাচ্ছে না; স্থানীয় কৃষির ক্ষতি হচ্ছে।

এই অঞ্চলের অধিকাংশ ইটভাটায় ড্রাম চিমনি ব্যবহার করা হয়, যা বাংলাদেশ সরকার থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; তবে হাওয়া ভাটাগুলোতে কংক্রিটের চিমনি ব্যবহার করতে দেখা যায়। জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার সামান্য, তবে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কাঠের ব্যবহার বেশি। ইটভাটাগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে ছাই এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস সরাসরি বায়ুতে প্রবেশ করছে, যা স্থানীয় বায়ুদূষণের সাথে সাথে স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির জন্যও দায়ী। স্বাস্থ্য খাত বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখেছি, বর্তমানে এই অঞ্চলের মানুষের বায়ুবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার অনেক বেড়েছে। ভাটা থেকে নির্গত কার্বনের অক্সাইডসমূহ [CO, CO2], সালফারের অক্সাইডসমূহ [SO2, SO3], নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ [NOx], হাইড্রোজেন সালফাইড [H2S] ইত্যাদি গ্যাস পরিবেশে এসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী। এই গ্যাসগুলো বৃষ্টির পানির সাথে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে লঘু কার্বনিক এসিড, লঘু সালফিউরিক এসিড, লঘু নাইট্রিক এসিডে পরিণত হয়। এই এসিডিক বৃষ্টির পানি যখন ভূমিতে অবস্থানরত বস্তুর ওপর পড়ে, তখন বেশ ক্ষতি করে থাকে।

২০১৭-তে এসিড বৃষ্টির একটি অভিযোগ পাওয়া যায় স্থানীয়দের কাছে। স্পষ্ট ভাবে এসিড বৃষ্টির কথা বলতে না পারলেও ২০১৭-তে হঠাৎ বৃষ্টির পর চরের একটি অংশের ফসলের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়, গাছের পাতা পুড়ে হলুদাভ বর্ণ ধারণ করেছিল বলে জানায় স্থানীয়রা। এছাড়াও ওই বৃষ্টিতে কিছু কিছু গৃহস্থের টিনের বাড়ির টিনে ছিদ্র হয়ে যায় বলে জানানো হয়। স্থানীয় কিছু লোকের শরীরে বৃষ্টির পানি পড়ার পর ফোস্কা পড়েছিল বলে জানা যায়। স্পষ্ট ভাবেই এটা এসিড বৃষ্টি ছিল। স্থানীয়দের মতে, এমন বৃষ্টি এর আগে কখনও এই অঞ্চলে হয়নি। ইটভাটার যাত্রা ২০১১-১২ সালের দিকে, এর পরপরই ২০১৭-তে এমন একটি ঘটনা ঘটা মোটেও সুখকর কিছু নির্দেশ করে না।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক : উফশী বীজের ধান রোপণের জন্য চাষিদের ব্যাপক হারে সার ও কীটনাশক দিতে হচ্ছে। এসব কীটনাশক ও রাসায়নিক সার সেচের পানি, বৃষ্টির পানি, এমনকি বর্ষায় পানি বৃদ্ধি পেলে সেই পানিতে মিশে সরাসরি খাল বা নদীর পানিতে মিশে যাচ্ছে। এসব কীটনাশক বা সার শুধু যে ফসলি জমির বাস্তুসংস্থান নষ্ট করছে এমন নয়, বরং এসব মিশ্রিত পানি যেখানে যেখানে যাচ্ছে সেখানেই বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তন করছে; যার দরুণ বর্তমানে চরের ভেতরের খাল বা আশপাশের নদীতে তেমন মাছের জোগান নেই। ক্ষতিকর পোকার সাথে সাথে অনেক উপকারী কীটপতঙ্গও মারা যাচ্ছে।

১০. ক্ষুদ্রঋণ, এনজিও এবং মেমানিয়ার উন্নয়ন

১০.১ ক্ষুদ্রঋণের পরিসংখ্যান

ক্ষুদ্রঋণ ব্যাপক জনপ্রিয় এই অঞ্চলে, বর্তমানে ঋণ নিতে মানুষের সংকোচবোধ হয় না বললেই চলে এবং দিন দিন এই জনপ্রিয়তা বেড়েই চলছে।

ক্ষুদ্রঋণের বর্তমান অবস্থা-২০১৮

অবস্থা	ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্থ নয়
হার	৫৫.৬৭%	৪৪.৩৩%

সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বর্তমানে ৫৫.৬৭ শতাংশ পরিবার ঋণগ্রস্ত রয়েছে এবং বাকি ৪৪.৩৩ শতাংশ পরিবার ঋণ নেয়া

ছিল না বা ঋণমুক্ত ছিল। এই ৪৪.৩৩ শতাংশ মানুষের মধ্যে ৬২.৭৯ শতাংশের পূর্বে ঋণ গ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তাদের ঋণ পরিশোধিত হয়েছে; বাকি ৩৭.২১ শতাংশ কখনই এনজিও থেকে ঋণ নেননি।

কখনই ঋণ না নেয়া পরিবারদের দাবি, সম্পদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তারা ঋণ নিতে আগ্রহী নন। কেননা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাদের বাড়িঘর, জমি, সম্পত্তি–সবকিছুই তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের চিন্তাভাবনার সৃষ্টি হয়েছে এনজিওগুলো ঋণ আদায়ের রূঢ় আচরণের জন্য।

১০.২ ক্ষুদ্রঋণ নেয়ার কারণ

বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন কাজেই ক্ষুদ্রঋণের সহায়তা নিচ্ছে। তবে পূর্ব থেকে বর্তমানে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনে পরিবর্তন এসেছে।

কারণ	শিক্ষা	কৃষি	বিদ্যুৎ	ব্যাবসা	জাল বোনার জন্য	দারিদ্র্যের জন্য	পারিবারিক কাজে
হার	৯.২৬%	৩১.৪৮%	৩.৭০%	৩১.৪৮%	১.৮৫%	৩.৭০%	১৮.৫২%

৯.২৬ শতাংশ পরিবারের ঋণ নেয়ার কারণ ছিল শিক্ষা; মূলত বিভিন্ন পরীক্ষার ফর্ম পূরণ বা স্কুলে ভর্তির অথবা বইখাতা কেনার উদ্দেশ্যেই এই ঋণ নেয়া হয়েছে। মানুষ কৃষি ও ব্যাবসার জন্য বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঋণ নিচ্ছে; কৃষি বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে শুরু হওয়ায় কৃষির জন্য ঋণ নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এছাড়াও বীজ, সার, ডিজেল, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্যও ঋণ নেয়া হয়েছে; তাছাড়া ব্যবসার মূলধন বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেও অনেকে ঋণ নিচ্ছে। পূর্বে ১০০ শতাংশ ঋণই সৌরবিদ্যুতের জন্য নেয়া হলেও ২০১৮-তে এর পরিমাণ নেমে এসেছে মাত্র ৩.৭ শতাংশে; প্রায় অধিকাংশ পরিবারেই সৌরবিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত হয়ে যাওয়ার দরুন এর চাহিদা কমে এসেছে। ঋণগ্রহীতাদের ১.৮৫ শতাংশ নিজেদের জাল বোনার জন্য ঋণ নিয়েছিল। একেবারেই অভাবের দরুন ৩.৭ শতাংশ পরিবার থেকে ঋণ নেয়া হয়েছিল; নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা খাবার কেনার জন্যই মূলত এই ঋণ নেয়া হয়েছিল। পারিবারিক কাজে ১৮.৫২ শতাংশ মানুষ ঋণ নিয়েছে; এই পারিবারিক কাজ বলতে অসুস্থতা, জমি কেনা, বাড়ি সংস্কার বা নির্মাণের জন্য, গবাদি পশু কেনার জন্য কিংবা বন্ধক রাখা জমি ছাড়ানোর জন্য বোঝানো হয়েছে।

১০.৩ ক্ষুদ্রঋণের নেতিবাচক দিক

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মেমানিয়ার জন্য আশীর্বাদ নিঃসন্দেহে, কারণ এর জন্যই মানুষের জীবনযাপনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে; তার পরও এর নেতিবাচক কিছু দিক রয়েছে। বিভিন্ন এনজিও থেকে দেয়া ক্ষুদ্রঋণের ওপর উচ্চ সুদ আরোপ মাঝে মাঝে দরিদ্র মেমানিয়ার মানুষের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গেছে এই সুদের ভার টানতে টানতে; কারও ভিটেবাড়ি সব বিক্রি করে দিতে হয়েছে ঋণ পরিশোধের জন্য। কারও ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একটি ঋণ পরিশোধের জন্য আরও ঋণ নিতে হচ্ছে গ্রাহককে; এভাবে ঋণ বাড়তেই থাকে।

মূলধারার ক্ষুদ্রঋণ বাদেও সঞ্চয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছিল। এই সুযোগে কিছু ভণ্ড এনজিওর আগমন হয় এমএলএম ব্যাবসার নামে (MLM); এদের কার্যক্রমের সময়কাল দেখা গেছে ২০১১-১৩ পর্যন্ত। এদের লোভনীয় অফারের ফাঁদে খুব সহজেই গ্রামের সরল মানুষদের ফেলা যেত। তারা মানুষকে ১০০ শতাংশ বা ২০০ শতাংশ সুদ প্রদানের লোভ দেখায়; প্রথম দিকে মানুষকে এভাবে ফেরত দিয়ে আস্থা অর্জনের পর বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে হঠাৎ করেই তারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ৪-৫টি এরকম প্রতারক এনজিওর সম্পর্কে জানা গেছে। এ ধরনের প্রতারণা সঞ্চয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ একেবারেই তলানিতে নিয়ে ঠেকিয়েছে; এজন্যই মেমানিয়াতে ঋণের চেয়ে সঞ্চয়ের প্রবণতা কম।

১০.৪ এনজিও এবং মেমানিয়ার উন্নয়ন

এনজিওগুলোর মেমানিয়ায় প্রবেশের কিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও মেমানিয়ার উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। ২০১৮-তে হয়ত বা ৮১.২১ শতাংশ পরিবার বিদ্যুতের আওতায় আসতে পারত না, যদি এনজিওর ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা না থাকত। ক্ষুদ্রঋণের সহায়তায় বর্তমানে মানুষ তাদের বইঠার নৌকাকে ট্রলারে রূপান্তর করতে পারছে। ক্ষুদ্রঋণের সহায়তার জন্য বর্তমানে এই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার বেশ পরিবর্তন হয়েছে; যদিও এখনও ৯২ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে, তবে অতীত থেকে আয় সূচকের বেশ উন্নয়ন হয়েছে। একসময় এই ইউনিয়নে শুধুমাত্র ছনের ঘর থাকলেও বর্তমানে টিন ও ইটের দালানই দেখা যায় বেশি।

বাড়ির অবস্থা	টিন	ছন	দালান
হার	৮৬%	৮.৬৭%	৫.৩৩%

বর্তমানে ৮৬ শতাংশ পরিবারের ঘরই টিনের তৈরি, ৮.৬৭ শতাংশ মানুষের ছনের ঘর রয়েছে এবং ৫.৩৩ শতাংশ মানুষ ইটের দালানে থাকছে। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রত্যন্ত এই অঞ্চলের উন্নয়ন পুরোদমে চলছে। এই পরিবর্তনের অবদান ক্ষুদ্রঋণের; মানুষ ঋণ পাচ্ছে বলেই নিজেদের ঘরবাড়ির পরিবর্তন করতে পেরেছে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পেরেছে; নইলে মূলধন ক্ষুদ্র এই অঞ্চলের মানুষের পক্ষে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা একরকম দিবাস্বপ্নের মতই ছিল।

১১. মেমানিয়ার জীবনযাত্রা

১১.১ পারিবারিক কাঠামো

কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়–১. মৌলিক বা অনু পরিবার, ২. যৌথ পরিবার। বিগত ৪০ বছরে মেমানিয়ার পরিবার গঠনে ব্যাপক বদল এসেছে।

সময়	২০১৮			১৯৮০ বা তার পূর্বে		
পরিবার	অনু	যৌথ	মোট	অনু	যৌথ	মোট
হার	৬০%	৪০%	১০০%	৩২.৮৬%	৬৭.১৪%	১০০%

২০১৮-এর তথ্য যাচাই করে দেখা যায়, বর্তমানে ৬০ শতাংশ পরিবারই অনু পরিবার, যৌথ পরিবারের হার ৪০ শতাংশ; ১৯৮০ বা তার পূর্ব নাগাদ এই হার ছিল যথাক্রমে ৩২.৮৬ শতাংশ এবং ৬৭.১৪ শতাংশ। অর্থাৎ বিগত ৪০ বছরে যৌথ পরিবার ভাঙনের হার ৪০.৪৩ শতাংশ এবং অনু পরিবার গঠনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৩.৬১ শতাংশ।

১১.২ আইন এবং এর প্রভাব

চরাঞ্চল হওয়ার দরুন এখানে আইনের প্রভাব খুবই নগণ্য। এখানে কোন পুলিশ স্টেশন নেই; ৬টি ইউনিয়নের জন্য একটি থানা, সেটিও চরের বাইরে। যখন কোন অপরাধ ঘটে পুলিশের পক্ষে সময়মত কখনই পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তথ্য যাচাই করে দেখা যায়, কোন অপরাধ হওয়ার পর পুলিশ আসতে গড়ে ৭.৮৪ ঘন্টা বা ৮ ঘন্টার মত লাগে। খুব কম সময়ই পুলিশ অপরাধীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। যদিও বা পুলিশ তাড়াতাড়ি আসেও, অপরাধীর পক্ষে চর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পথের অভাব নেই, চারপাশে পানি-নৌকাযোগে বা সাঁতরে খুব সহজেই অপরাধী চর থেকে বের হয়ে চলে যেতে পারে। স্পষ্টভাবেই আইনের প্রভাব খুবই সামান্য এখানে।

গ্রামপঞ্চায়েত চরের মানুষের বিভিন্ন বিচার সম্পন্ন করে থাকে; ইউনিয়ন চেয়ারম্যানসহ স্কুল মাস্টার এবং বিভিন্ন নেতা নিয়ে এই পঞ্চায়েত গঠিত হয়; পঞ্চায়েতের কোন নির্দিষ্ট সদস্য নেই; বাদী ও বিবাদী পক্ষে গণ্যমান্য যাদেরকে বিচারে ডাকবে, তারাই তখন বিচারকাজে মতামত দেবে। তবে এখানে লবিং চলে ব্যাপকভাবে। হর্তাকর্তাদের আগ থেকেই টাকা দিয়ে বিচার নিজের দিকে নেয়ার প্রবণতা উভয় পক্ষের মধ্যেই দেখা যায়। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের যাদের বিচার করার কথা তাদের পকেট ফুলে ফেঁপে ওঠে উভয় পক্ষের দেয়া টাকায়। উপরি পাওনার ব্যাপার থাকায় পঞ্চায়েত সদস্যরাও বিচারের মীমাংসা করতে চায় না, জিইয়ে রাখে। অনেক সময় বাদী বা বিবাদীকে বিচার না মানতে দেখা যায়; কেউ যদি বলে সে বিচার মানে না, তবে বিচারের মীমাংসা যা-ই হোক না কেন তা চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে না। যেহেতু বিচারের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা উভয় পক্ষ থেকেই উৎকোচ নিয়ে থাকেন, সেহেতু অধিকাংশ সময়ই দোষী ব্যক্তিকে শিখিয়ে দেয়া হয়, সে যেন বিচার না মানে–তাহলে বিচারে নেয়া সিদ্ধান্ত তার ওপর কার্যকর হবে না। এভাবেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে এই অঞ্চলে আইনের নামে বেআইনি কাজ চলছে যুগের পর যুগ।

১১.৩ বিনোদন

বিনোদনের ক্ষেত্র মেমানিয়ার তেমন প্রসারিত নয়। ২০০০ সালের আগেও মানুষের প্রযুক্তিগত বিনোদনের সুযোগ ছিল না। বিভিন্ন শারীরিক গ্রামীণ খেলাই ছিল তাদের বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম; এর মাঝে কাবাডি, নৌকাবাইচ উল্লেখযোগ্য। সময়ের পরিবর্তনে অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে, এখন গ্রামের কিশোরদের ক্রিকেট-ফুটবল খেলতে দেখা যায়, দেখা যায় মার্বেল-তাস-জুয়া খেলতে। এর অধিকাংশতেই অর্থের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। টিভি মানুষের প্রাথমিক বিনোদনের মাধ্যম বর্তমানে; যদিও সবার ঘরে টিভি নেই। যাদের বাড়ি টিভি নেই, তারা অন্যদের বাড়িতে বা স্থানীয় বাজারে টিভি দেখতে যায় রাতের বেলা সব কাজ শেষে।

২০০৪-০৫-এর দিকে মেমানিয়ায় ক্যাসেট প্লেয়ারের চল শুরু হয়। তখন ব্যাটারি দিয়ে এসব ক্যাসেট প্লেয়ার চালানো হত, মানুষ অন্যের বাড়িতে ভিড় করত এসব ক্যাসেট প্লেয়ারে নাটক বা ছবি শোনার জন্য। এরপর আস্তে আস্তে টিভি প্রবেশ করে, সৌরবিদ্যুতের প্রসারে মানুষের অনেকেই টিভি কেনে বিনোদনের জন্য। এসব টিভিতে কোন চ্যানেল দেখা যায় না, এত দূরবর্তী এলাকায় ডিশের কোন সংযোগ নেই; ডিভিডিতে একই ছবি ঘুরিয়ে বারবার দেখার মাধ্যমেই মানুষ বিনোদন গ্রহণ করে চলে।

তবে স্থানীয় যুবকদের মধ্যে বর্তমানে টিভির পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিচরণের ব্যাপারটিও দেখা যায়। স্মার্টফোনের দৌলতে তারা খুব সহজেই অনলাইন দুনিয়াতে প্রবেশ করতে পারছে। অনলাইন দুনিয়ার ভাল দিকের চেয়ে নেতিবাচক দিক থেকে বিনোদন নেয়ার হারই বেশি দেখা যায় এই এলাকার কিশোর ও যুবকদের মাঝে।

মোঃ শফিকুল ইসলাম : স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : shafiqi.mohsin@gmail.com

সূত্র: প্রথম আলো, ১ ডিসেম্বর, ২০১৯

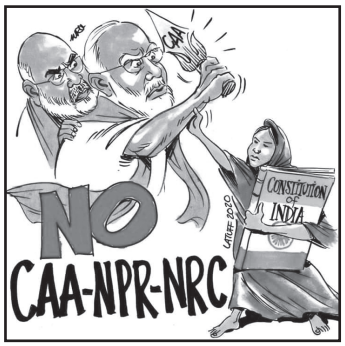

ফেসবুক থেকে সংগৃহীত